Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের আলোকে নাস্তিকতা ও দাওয়াহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমাউল হুসনা সুপ্তি

রোলঃ ২১৫০০৭৮৯

৯ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের আলোকে নাস্তিকতা ও দাওয়াহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমাউল হুসনা সুপ্তি

রোলঃ ২১৫০০৭৮৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের আলোকে নাস্তিকতা ও দাওয়াহ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমাউল হুসনা সুপ্তি, আইডিঃ ২১৫০০৭৮৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুহ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামের আলোকে নাস্তিকতা ও দাওয়াহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shupty

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

আসমাউল হুসনা সুপ্তি

আইডিঃ ২১৫০০৭৮৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.ভূমিকা	৫
২.নাস্তিক্যবাদ	৮
৩.ব্যুৎপত্তি	৯
৪.নাস্তিকতা বনাম ধর্ম	১১
৫.নব-নাস্তিক্যবাদ	১২
৬.সাধারণ প্রশ্ন-উত্তর	১৩
৭.দাওয়াহ দেয়ার পদ্ধতি	৩০
৮.উপসংহার	৫৮
৯.তথ্যসূত্র	৬১

ভূমিকা

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে-আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই,হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

সমস্ত প্রশংসা রব্বুল আলামীনের।যিনি এই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।আমরা তারই ইবাদত করি তার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।তিনিই আমাদের সরল,সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

হেদায়েত আল্লাহর দেয়া অনেক বড় অনুগ্রহ।হেদায়েত দানের ক্ষমতা একমাত্র তারই রয়েছে।আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন সেই হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়েত দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই।

কুরআনে কারীমের এরশাদ করেছেন-

“ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন”(সূরা মুদ্দাসিসর-৩১)

হেদায়াত দানের ক্ষমতা একমাত্র সর্বশক্তিমান রব্ব আল্লাহর নিকটেই রয়েছে।আমাদের কাজ হচ্ছে মানুষের নিকট দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়া।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

“আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।”(সূরা ফুসসিলাত:৩৩)

সত্য ও মিথ্যার লড়াই মানবসভ্যতার শুরু থেকেই।ইসলাম বরাবরই এসব জাহেলিয়াতের অপপ্রচারকারীদের বিদ্বেষ মোকাবেলা করে আসছে।প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যদি কারো অন্তরে মোহর মেরে দেন তাহলে তাকে কেউ সরল পথ প্রদর্শন করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা কেবল তাকেই হেদায়েত দান করেন যে হেদায়েত পাওয়ার উপযুক্ত এবং তাকেই পথভ্রষ্ট করেন যে পথভ্রষ্ট হওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"কিন্তু তারা যখন বাঁকা পথ ধরল, তখন আল্লাহ্ও তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিলেন।"(সূরা আছ-ছফ:৫)

আমাদের অন্তর যেন বক্র হয়ে না যায় তাই আমরা সালাতে আল্লাহর কাছে সরল পথ প্রদর্শনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করি—

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

“ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।”(সূরা ফাতিহা:৬)

স্রষ্টায় অবিশ্বাসী বহু মানুষ পৃথিবীতে রয়েছে। যারা তাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা নিজেদের মাঝে তৈরি করা কিছু অযৌক্তিক কারন দাড় করিয়ে সৃষ্টিকর্তা যে একজন আছেন সেটাই অবিশ্বাস করে।অথচ স্রষ্টা হলেন সমস্ত যুক্তি তর্কের উর্ধ্বে। পৃথিবীতে কোনো কিছুই নিজে নিজেই হয়ে যায় না এর একজন সূক্ষ্ম পরিচালক রয়েছে।

তাগুতী শক্তির সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন হলো নাস্তিক্যবাদ। নাস্তিক্যবাদের হাত ধরেই বর্তমান পৃথিবীর সকল তাগুতী শক্তি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম ও মুসলিমকে নিশ্চিহ্ন করার হীন উদ্দেশ্যে উঠেপড়ে লেগেছে। নাস্তিকতা হচ্ছে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, প্রজ্ঞাময়, পরাক্রমশালী, আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্ব অবিশ্বাস করার শয়তানী মতবাদ। নাস্তিক্যবাদিরা আল্লাহ তা‘আলার অসীম ক্ষমতা, অপার কুদরত, সুবিশাল মালিকানা ও যাবতীয় গুণাবলী অস্বীকার করে। জান্নাত, জাহান্নাম, পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবনকে অসম্ভব জ্ঞান করে। তাদের ধারণা, এ মহাবিশ্ব প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এর কোনো ব্যবস্থাপক নেই।একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সামনে রেখে তাদের জীবন পরিচালিত করে। এটা যে মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয় তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।বস্তুতঃ নাস্তিকরা সত্যের অপলাপকারী, সত্যে অবিশ্বাসী। তারা শুধু বস্তুবাদে বিশ্বাসী। বস্তুবাদের রূপই হল নাস্তিকতা।

সত্য কথা হলো আল্লাহকে কেউ যদি জোর করে অস্বীকার না করে, খোলা মন নিয়ে যদি বিশ্বচরাচরে দৃষ্টিপাত করে তাহলে তার কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

'যদি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।' (সূরা আল-আম্বিয়া: ২২)

দাওয়াতের নিয়তে রব্বের সন্তুষ্টি লাভের আশায় "ইসলামের আলোকে নাস্তিকতা ও দাওয়াহ" নামক থিসিসের কাজে এই অধম বান্দীর ক্ষুদ্র বিনিয়োগ।রব্ব যেন এ উসিলায় দায়ীয়া হিসেবে কবুল করে নেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় মুহতামিম মুফতি যুবায়ের আহমাদ(হাফিজাহুল্লাহ) ও ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মারছুছ উস্তাযের প্রতি যাদের ছত্রছায়ায় আমাদের এ যাত্রা।ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মারছুছ উস্তায আমাদের থিসিসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন,উনার মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়ে আমাদেরকে থিসিসের কাজে সহায়তা করেছে,আলহামদুলিল্লাহ ।আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সমস্ত শ্রদ্ধেয় উস্তাযগনের খেদমাত কবুল করে নিন,জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন,আমিন।

আমরা যারা এই থিসিসে অংশগ্রহন করেছি আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের কাজকে কবুল করে নিন।প্রত্যেককে মুত্তাকী হিসেবে,দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে,ত্বলিবুল ইল্ম হিসেবে কবুল করে আমাদের ক্রুটিগুলোকে ক্ষমা করে দিন,আমিন।

সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি নির্ভুল তথ্য দেয়ার,তবুও ভুলক্রুটি থাকা মানবীয় ফিতরাত।তাই ভুল ক্রুটিগুলো ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

নাস্তিক্যবাদ

নাস্তিক্যবাদ -অন্যান্য নাম: নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিকতাবাদ (ইংরেজি: Atheism) একটি দর্শনের নাম যাতে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না এবং সম্পূর্ণ ভৌত এবং প্রাকৃতিক উপায়ে প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়। মূলত আস্তিক্যবাদ এর বর্জনকেই নাস্তিক্যবাদ বলা যায়।[৫]

এথিয়েস্ট অ্যালায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক অনুমোদিত নাস্তিক্যবাদের প্রতীক। [১][২]

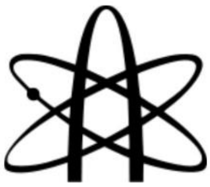

পারমাণবিক ঘূর্ণি , আমেরিকান এথিয়েস্টস কর্তৃক অনুমোদিত নাস্তিক্যবাদের প্রতীক।[৩][৪]

নাস্তিক্যবাদ বিশ্বাস নয় বরং অবিশ্বাস এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাসকে খণ্ডন নয় বরং বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই এখানে মুখ্য।[৬]শব্দটি সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতি বিশ্বাস কে ভ্রান্ত বলে তারা স্বীকার করে। দিনদিন মুক্তচিন্তা, সংশয়বাদী চিন্তাধারা এবং ধর্মসমূহের সমালোচনা বৃদ্ধির সাথে সাথে নাস্তিক্যবাদেরও প্রসার ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম কিছু মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার ২.৩% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয় এবং ১১.৯% মানুষ কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করে না।[৭] জাপানের ৩১% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়।[৮][৯] রাশিয়াতে এই সংখ্যা প্রায় ১৩% এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর দেশগুলোতে

১২% নাস্তিক, (৬% শুধুমাত্র ইতালিতেই) থেকে শুরু করে ৪৬% থেকে ৮৫% (সুইডেন) মত।[৮]

পশ্চিমের দেশগুলোতে নাস্তিকদের সাধারণ ভাবে ধর্মহীন বা পারলৌকিক বিষয় সমূহে অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিছু নাস্তিক ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু ধর্মের দর্শন, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং প্রকৃতিবাদ, বস্তুবাদ ইত্যাদি দর্শনে বিশ্বাস করে। নাস্তিকরা মূলত কোনো বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নয় এবং তারা সকলে বিশেষ কোন আচার অনুষ্ঠানও পালন করে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যে কেউ, যেকোনো মতাদর্শে সমর্থক হতে পারে, নাস্তিকদের মিল শুধুমাত্র এক জায়গাতেই, আর তা হল ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কে অবিশ্বাস করা।

ব্যুৎপত্তি

গ্রীক শব্দ αθεοι (*atheoi*) তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইফিষীয়দের ২:১২ প্যাপিরাস ৪৬-এ দেখা যায়। এর ইংরেজি অনুবাদ হলো "(যারা) ঈশ্বর বিহীন।"[৪১]

প্রারম্ভিক প্রাচীন গ্রিক ভাষায়, বিশেষণ *átheos* (ἄθεος, ব্যক্তিগত ἀ- + θεός থেকে "ঈশ্বর") অর্থ "ঈশ্বরহীন"। এটি প্রথমে কুৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো, মোটামুটিভাবে যার অর্থ ছিলো "অধার্মিক" বা "অপরাধী"। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে, শব্দটি "ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা" বা "ঈশ্বরকে অস্বীকার করা" অর্থে অধিক ইচ্ছাকৃত এবং সক্রিয় ঈশ্বরহীনতা নির্দেশ করতে শুরু করে। এরপর ἀσεβής (*asebēs*) শব্দটি যারা স্থানীয় দেবতাদের অসম্মান করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ

করা হয়েছিলো। এমনকি তারা অন্য দেবদেবীতে বিশ্বাস করলেও এই শব্দটি প্রয়োগ করা হতো। ধ্রুপদী পাঠ্যের আধুনিক অনুবাদগুলো কখনও কখনও *átheos* কে "atheistic" বা নিরীশ্বরবাদী হিসেবে অভিহিত করে। একটি বিমূর্ত বিশেষ্য হিসাবে, ἀθεότης (*atheotēs*) ব্যবহৃত হতো যার অর্থ , "নাস্তিকতা"। সিসেরো গ্রীক শব্দটিকে ল্যাটিন átheos-এ লিপিবদ্ধ করেন। প্রারম্ভিক খ্রিস্টান এবং হেলেনিস্টদের মধ্যে বিতর্কে শব্দটি নিয়মিত ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় , যেখানে প্রতিটি পক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করতো। [৪২]

ইংরেজি "এথিস্ট" শব্দটি এসেছে (ফরাসী *athée*) থেকে, যার অর্থ "সে সব মানুষ, যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রত্যাখান করে",[৪৩] ইংরেজিতে এই শব্দের ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায় ১৫৬৬ সালের পূর্বভাগে,[৪৪] এবং ১৫৭১ সালে।[৪৫] এথিস্ট শব্দটি ব্যবহারিক ভাবে ঈশ্বরবিহীন আখ্যা হিসেবে ১৫৭৭ সালে।[৪৬] ইংরেজি *এথিজম* পদবাচ্য এসেছে ফরাসি *athéisme*,[৪৭] থেকে এবং ইংরেজিতে ১৫৮৭ সালে তা প্রতীয়মান হয়।[৪৮] ১৫৩৪ সালে একটি *এথিওনিজম* হিসেবে একটি বিষয়ে নাস্তিক্যবাদকে প্রকাশ করা হয়েছিল।[৪৯][৫০] সমসাময়িক শব্দ হিসেবে: ১৬২১ সালে *শ্বরবাদী*,[৫১] ১৬৬২ সালে *আস্তিক্যবাদ*,[৫২] ১৬৭৫ সালে *শ্বরবাদ*,[৫৩] এবং ১৬৭৮ সালে *আস্তিক্যবাদ* পদবাচ্যের উদ্ভব হয়।[৫৪] সেইসময় "শ্বরবাদ" এবং "শ্বরবাদী" পদব্যাচ্যের আধুনিক অর্থ উদ্ভূত হয়। আস্তিক্যবাদের সাথে শ্বরবাদের পার্থক্য এভাবেই উৎসররিত হয়।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং লিখেছেন যে, "১৬ এবং সতেরো শতকে নাস্তিক্যবাদ শব্দটি শুধুমাত্র সম্পূর্ণভাবে বিতর্কিত তর্কশাস্ত্রীয় ছিল... সেসময় নাস্তিক্যবাদ পদবাচ্য টি একপ্রকার অপমানজনক শব্দ ছিল এবং কেউই নিজেকে নাস্তিক হিসেবে অভিহিত করার কথা স্বপ্নেও ভাবত না।"[৫৫]

নিজেকে নাস্তিক হিসেবে অভিহিত করার প্রথম ধাপ শুরু হয় ইউরোপে ১৮ শতকের শেষভাগে। সেসময় বিশেষত একেশ্বরবাদী আব্রাহামিক ঈশ্বরের প্রতি যে অবিশ্বাস তা প্রকাশ করাই ছিল নাস্তিকতা।[৫৬] বিশ শতকে বিশ্বায়নের মাধ্যমের এই শব্দের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য এর অর্থ দাঁড়ায় সর্বপ্রকার দৈবশক্তিতে অবিশ্বাস। যদিও বর্তমানে পশ্চিমা

সমাজে শুধুমাত্র "ঈশ্বরে অবিশ্বাস"কেই সাধারণত নাস্তিক্যবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২১]

নাস্তিকতা বনাম ধর্ম

আঠারো শতকের পূর্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পশ্চিমা সমাজে এতটাই স্বীকৃত ছিল যে, এমন কি প্রকৃত নাস্তিকতাই সেখানে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। এ বিষয়টিকে বলা হত *জন্মগত বিশ্বাসী*। এর মানে হলো মানুষ জন্মগত ভাবেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নাস্তিকতা সেখানে সহজাতভাবেই প্রত্যাখাত একটি বিষয় ছিল।[৩৭]

সাধারণ মানুষের একপক্ষ আবার নাস্তিকদের নিয়ে একটি বিশেষ ধারণা পোষণ করতো। তাদের দাবী অনুসারে একজন নাস্তিক তীব্র বিপদের সময় হঠাৎই ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে আসে, তারা মৃত্যু কালীন সময়ে ধর্মান্তরিত হয় এবং চরম বিপদ যেমনঃ দুর্যোগ বা "যুদ্ধকালীন সময়ে কোনো নাস্তিকই নাস্তিক থাকে না"।[৩৮] পক্ষান্তরে তীব্র দুর্যোগের মুহুর্তেও যে মানুষ নাস্তিক থাকতে পারে, এরূপ উদাহরণও আছে।[৩৯]

কিছু নাস্তিক নাস্তিকতাবাদের খুব বেশি প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। স্যাম হ্যারিস তার বই *লেটার টু অ্যা ক্রিশ্চিয়ান নেশনে* লিখেন:

প্রকৃতপক্ষে, "নাস্তিকতাবাদ" হচ্ছে এমন একটি পদবাচ্য, যার অস্তিত্বই থাকা উচিত না। কেওই নিজেকে "আমি জ্যোতিষ নই" বা "আমি আলকেমিস্ট নই" এই মর্মে অভিহিত করেন না। যেসব ব্যক্তি সন্দেহ করে এলভিস [একজন আমেরিকান সংগীত শিল্পী] এখনো জীবিত থাকতে পারে অথবা এলিয়েনরা হাতের ছোয়ায় এই মহাবিশ্বকে তাদের গোয়ালের প্রাণী বানিয়ে রাখবে, তাদের জন্য শব্দ খরচ করার মত শব্দ আমাদের নেই। যে ধর্মের সত্যতা নির্ধারণ করা যায় না, এজাতীয় ধর্মের বিপরীতে যুক্তিবাদী ব্যক্তির যে কোনো শব্দই নাস্তিক্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। স্বতন্ত্রভাবে নাস্তিক্যবাদ শব্দটির আমদানী অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার মাত্র।"[৪০]

নব-নাস্তিক্যবাদ

একবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন নাস্তিক গবেষক ও সাংবাদিকের প্রচেষ্টায় নাস্তিক্যবাদের একটি নতুন ধারা বেড়ে উঠেছে যাকে "নব-নাস্তিক্যবাদ" বা "New Atheism" নামে ডাকা হয়। ২০০৪ সালে স্যাম হ্যারিসের *দি ইন্ড অব ফেইথ: রিলিজান, টেরর, এন্ড দ্যা ফিউচার অব রিজন* বইয়ের মাধ্যমে নব-নাস্তিক্যবাদের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে মনে করেন আরেক প্রখ্যাত নব-নাস্তিক ভিক্টর স্টেংগার। প্রকৃতপক্ষে স্যাম হ্যারিসের বই প্রকাশের পর এই ধারায় আরও ছয়টি বই প্রকাশিত হয় যার প্রায় সবগুলোই নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলারে স্থান করে নিতে সমর্থ হয়। সব মিলিয়ে নিচের বইগুলোকেই নব-নাস্তিক্যবাদী সাহিত্যের প্রধান উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়:

- দি এন্ড অব ফেইথ: রিলিজান, টেরর, এন্ড দ্যা ফিউচার অব রিজন (২০০৪) – স্যাম হ্যারিস
- লেটার টু এ কৃশ্চিয়ান নেশন (২০০৬) – স্যাম হ্যারিস
- দ্যা গড ডিলিউশন (২০০৬)-রিচার্ড ডকিন্স
- ব্রেকিং দ্যা স্পেল: রিলিজান এ্যাজ এ ন্যাচারাল ফেনোমেনন (২০০৬) – ড্যানিয়েল ডেনেট
- গড: দ্যা ফেইলড হাইপোথিসিস- হাউ সাইন্স শোজ দ্যাট গড ডাজ নট এক্সিস্ট (২০০৭)- ভিক্টর স্টেংগার
- গড ইজ নট গ্রেট: হাউ রিলিজান পয়জনস এভরিথিং (২০০৭) – ক্রিস্টোফার হিচেন্স
- দ্যা নিউ এইথিজম (২০০৯) – ভিক্টর স্টেংগার

শেষোক্ত বইয়ে ভিক্টর স্টেংগার এই ব্যক্তিদেরকেই নব-নাস্তিক্যবাদের প্রধান লেখক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উল্লেখ্য, নব-নাস্তিকেরা ধর্মের সরাসরি বিরোধিতা করেন।

তারা ধর্মকে প্রমাণবিহীন বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করেন এবং এ ধরনের বিশ্বাসকে সমাজে যে ধরনের মর্যাদা দেয়া হয় সেটার কঠোর বিরোধিতা করেন।[৬৮]

সাধারন প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন-১:স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল?

উত্তর : স্রষ্টা এমন সত্তা যিনি সৃষ্ট নন, তিনি অস্তিত্বে আসেন নি বরং সর্বদা অস্তত্বিশীল এবং তিনি সৃষ্টিজগতের স্থান-কাল কাঠামোর অংশ নন । আর এজন্যই তিনি অসৃষ্ট বা অবস্তু, ফলে তাঁর সৃষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই ।

এই মহাবিশ্ব কোন জ্ঞানসম্পন্ন সত্তা নয় যে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, পরিচালনা করতে পারে। বরং মহাবিশ্বের সকল ব্যবস্থা ও সকল অংশ ইংগিত করছে যে, তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এজন্য কোন স্রষ্টা ব্যতীত মহাবিশ্বের স্বয়ংসর্ম্পূণ অস্তিত্বের ধারণা সর্ম্পূণ যুক্তি বিরোধী, তাই এক্ষেত্রে একমাত্র যৌক্তিক সম্ভাবনা হচ্ছে এই যে, এর একজন জ্ঞানী স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী থাকতে হবে যিনি নিজে সৃষ্ট নন।

◆ এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

*বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়

*আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী

*তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি

*এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।(সূরা ইখলাস:১-৪)

প্রশ্ন-২:আল্লাহ রিজিকদাতা হলে মানুষ না খেয়ে মারা যায় কেন?

উত্তর: রিজিকের মালিক আল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

*ধনীদের সম্পদের গরীবের অধিকার রয়েছে।এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে--

আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।(সূরা যারিয়াত-১৯)

*রিজিকের জন্য নিজেদেরও চেষ্টা পরিশ্রম করতে হবে।

*আল্লাহ মানুষ রিজিক দিয়েও পরীক্ষা করেন

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে--

তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিয্ক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।(সূরা-মূলক:১৫)

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।(সূরা-বাকারাহ-১৫৫)

*ইসলাম কখনোই বলে না মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকুক এমনিতেই রিজিক আসবে।

নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।(সূরা-রাদ:১১)

প্রশ্ন-৩:আল্লাহ যদি অভাবগ্রস্থ না হন তাহলে ঋন চাইলেন কেন?

উত্তর: আল্লাহকে ঋন দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর রাস্তায় দান করা।আল্লাহ কখনোই আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন,বরং আমাদের যে সম্পদ রয়েছে সবকিছু আল্লাহই দেওয়া রিজিক।

◆ আল্লাহ বলেন--

কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।(সূরা-বাকারাহ-২৪৫)

এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম করয দিবে ? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।(সূরা-হাদিদ-১১)

◆ আল্লাহ সুবহানুতায়ালা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন--

*হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।(সূরা-ফাতির-১৫)

*আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।(সূরা-ইখলাস:২)

প্রশ্ন-৪:ইসলামে মহিলারা কেন একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না?

উত্তর: আল্লাহ তায়ালা ইসলামে মহিলাদেরকে একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিয়ের অনুমতি দেন নি এর অনেক হিকমাহ রয়েছে।

এজন্য দেখা যায় যে,পৃথিবীতে মুসলিম নারীর চেয়ে পবিত্র ও বিশুদ্ধ নারী অন্য কোন ধর্মে নেই।

একজন পুরুষের একধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মাতা-পিতার পরিচয় খুব সহজেই পাওয়া যায়। শিশুর পিতা কে আর মাতা কে। অপরদিকে একজন নারী যদি একাধিক স্বামী গ্রহণ করে তবে এ পরিবার জন্ম নেয়া শিশুর শুধু মায়ের পরিচয় পাওয়া যাবে-বাবার নয়। পিতা ও মাতার সুস্পষ্ট পরিচয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম আপোসহীন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানিরা বলেন, যে শিশু তার মাতা-পিতার পরিচয় জানে না, বিশেষ করে পিতার- সে শিশু তীব্র মানসিক জটিলতা ও হীনমন্যতায় ভোগে।

আল্লাহ তায়ালা কোনো তালাক প্রাপ্ত নারীকেও দ্বিতীয় বিয়ের পূর্বে তিন মাসের একটি গ্যাপ রাখতে বলেছেন।

◆ তিনি পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন–

"তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত অপেক্ষা করবে"(সূরা আল-বাকারাহ:২২৮)

বর্তমান বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছে যে–

প্রথম মাসিক আসার পর একজন মহিলার শরীর থেকে ৩২% থেকে ৩৫% পর্যন্ত প্রোটিন শেষ হয়ে যায়,

এবং দ্বিতীয় মাসিক আসার পর তার শরীর থেকে ৬৭ থেকে ৭২% ডিএনএ ধ্বংস হয়ে যায়।

এবং তৃতীয় মাসিকের পর ৯৯.৯% পর্যন্ত প্রোটিন নির্মূল হয়ে যায়। এরপর জরায়ু আগের ডিএনএ থেকে সম্পন্নরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং কোন প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই নতুন ডিএনএ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

এজন্য যদি একই সাথে বেশ কয়েকজনের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে, তাহলে তার শরীরে বিভিন্ন ধরণের ডিএনএ জমা হয় যা বিপজ্জনক ভাইরাসের রূপ নেয় এবং মারাত্মক রোগ সৃষ্টির কারণ হয়।

বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, তার ইদ্দত তালাকপ্রাপ্ত মহিলার চেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪ মাস ১০ দিন।

এর কারণ হলো দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণে তার শরীর থেকে প্রাক্তন ডিএনএ দ্রুত শেষ হয় না,

এটি শেষ হতে আগের চেয়ে বেশি সময় লাগে, আর এ জন্য মহিলাদের ইদ্দত চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

◆ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে।"(আল-বাকারাহ:২৩৪)

এজন্য ইসলামে একজন মহিলার জন্য একই সময়ে একাধিক বিয়ে বা একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি।

প্রশ্ন-৫:কুরআনের মতো কোনো বই নাকি লেখা সম্ভব না?

উত্তর: কুরআনের সমতুল্য কোন কিতাব(বই) এই পৃথিবীতে নাই । কুরআন রয়েছে অসংখ্য মিরাকল। কুরআনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন আয়াত, কুরআনের বিভিন্ন ভবিষ্যৎবানী, কুরআনের শব্দবিন্যাস, আরবী ভাষার উপর কুরআনের প্রভাব, কুরআন যেভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে – এই প্রত্যেকটা ব্যাপারই ইউনিক। পৃথিবীর আরো কোন কিতাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নাই।

আয়াতের দিক থেকে কুরআনের অন্যতম ছোট সূরা হলো সূরা ইখলাস। প্রায় ১৪০০ বছর আগে থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ এই সূরাটি পড়েছে, পড়ছে, মুখস্থ করেছে, করছে, ঠিক সেই উচ্চারণে যেই উচ্চারণে এটি প্রথমবার মানুষ শুনেছিলো।

এখন কেউ পারলে এরকম চারটি লাইন অন্য কোনো বই থেকে এনে দেখাক যেটা হাজার বছর ধরে মানুষ এত গুরুত্বের সাথে আমল করছে।

এই চ্যালেঞ্জ কার্যকর কেউই করতে পারবে না।

◆ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

তারা কি বলে, 'সে(মুহাম্মাদ ﷺ)তা বানিয়েছে'? বল, 'তবে তোমরা তার মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।(সূরা ইউনুস:৩৮)

”আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।”(সূরা বাকারাহ:২৩)

প্রশ্ন-৬: ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম কেন? অথচ শূকর আল্লাহরই একটি সৃষ্টি। হারামই যদি হয় তাহলে আল্লাহ শূকরকে সৃষ্টি করলেন কেন?

উত্তর : মহান প্রতিপালক আমাদের জন্য শূকর খাওয়া অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন--

বল, ‘আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশ্ত হয়- কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র কিংবা এমন অবৈধ যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(সূরা আনআম: ১৪৫)

যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।(সূরা আরাফ: ১৫৭)

শূকর নাপাক ও নিকৃষ্ট প্রানী এ ব্যাপারে আমরা এক মূহুর্তের জন্যই।সন্দেহ পোষণ করি না।

শূকর ময়লা আবর্জনা খেয়ে জীবন ধারন করে।

এর গোশত মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক,বিভিন্ন ধরনের মারাত্নক রোগ সৃষ্টির কারন হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে এমন অনেক কষ্টদায়ক বা অপবিত্র বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং এর পিছনে অনেক হিকমাহও রয়েছে।

সৃষ্টিকর্তার এই অধিকার অবশ্যই রয়েছে যে তিনি তার বান্দাদের যা খুশি নির্দেশ করবেন,এ ব্যাপারে সমালোচনার অবকাশ নেই।

তাই মাখলুক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো শুনলাম এবং মানলাম।

প্রশ্ন-৭:আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান এবং পরম করুনাময় হন, তাহলে পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট কেন?

উত্তর: পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট থাকলেও পৃথিবীতে অনেক আনন্দও আছে। বরং, পৃথিবীতে আনন্দই বেশী, নাহলে অধিকাংশ মানুষ বেঁচে থাকতে চাইত না।

*বলুন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে? বলুন, এসব তো ঈমানদারদের জন্য – পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে।(সূরা আ'রাফ:৩২)

আল্লাহ্ আমাদের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেন, যাতে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি এবং কঠিনতর পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি।

*তিনি (আল্লাহ্) বললেন: আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (সূরা বাক্বারাহ্:৩০)।

এই পৃথিবীটা হলো একটা পরীক্ষার জায়গা। আল্লাহ্ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করছেন। এই পরীক্ষা আনন্দদায়ক হতে পারে, আবার কষ্টেরও হতে পারে।

◆ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর (কাউকে) ধনেপ্রাণে বা ফলফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব। আর যারা ধৈর্য ধরে তাদের তুমি সুখবর দাও। (তারাই ধৈর্যশীল) যাদের ওপর কোন বিপদ এলে বলে,

নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তারই দিকে ফিরে যাব'। এদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হয় এবং এরাই সুপথগামী।" (সূরা-বাক্বারাহ:১৫৫-১৫৭)

আল্লাহ্ মানুষকে পরীক্ষা করেন বিভিন্ন আনন্দদায়ক ও দু:খজনক ঘটনার মাধ্যমে। এই জীবন শুধুই একটা পরীক্ষাকেন্দ্র, পরকালের জীবনই আসল জীবন।

"আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়; আর সাবধানীদের জন্য পরকালের আবাসই ভালো; তোমরা কি বোঝ না? " (সূরা আন'আম:৩২)

প্রশ্ন-৮:স্রষ্টার কি অস্তিত্ব আছে?

উত্তর: আমরা তাঁর নিদর্শন দেখে, তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি দেখে; আসমান, যমিন, পাহাড়-পর্বত দেখে এবং আমাদের নিকট যে অবিকৃত কুরআন আছে, এ-মুজিযা দেখে জানতে পারবো যে, আল্লাহ আছেন। আর এসবকিছুই বলে দেয় যে, এক আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর মহাসত্তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন--

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ব্যাপারে কি তোমরা সন্দেহের মধ্যে রয়েছ?" (সূরা ইবরাহীম - ১০)

আল্লাহ তাআলা মহাজগতে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণকারী নিদর্শনাবলির প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন—

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে অবশ্যই নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বশয়নে আল্লাহকে স্মরণ করে। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র মহান। তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো জাহান্নামের শাস্তি থেকে”

(সূরা আলে ইমরান: ১৯০-১৯১)

বিশ্বাসীগণের বিবেকের কাছে এ প্রশ্ন রেখে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

“আর বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে আমার নিদর্শনাবলি এবং স্বয়ং তোমাদের মাঝেও। সুতরাং তোমরা কি অনুধাবন করবে না? আকাশে বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণ ও তোমাদেরকে যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।”
(সূরা যারিয়াত : ২০-২১)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বহু আয়াতে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন।

প্রশ্ন-৯:কুরআন আরবীতে কেন নাযিল হয়েছে?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্।

পবিত্র কুরআন যদিও এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং তা প্রকাশ হয়েছে আরবী ভাষায় কারন-

*এটা আরবে নাযিল হয়েছে-

আরবের ভাষা আরবী, অতএব নাযিলকৃত বানীও হওয়া উচিৎ সে দেশের ভাষায়। এটা অন্য ভাষায় নাযিলের যুক্তিকতা নেই। একইভাবে তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল হিব্রু ভাষায় নাযিল হয়েছে কারন সেস্থানের ভাষা ছিল হিব্রু।

*নবীর মাতৃভাষা-

২য় পয়েন্ট হলো যেহেতু এটি মোহাম্মদ (ﷺ) বা সর্বশেষ নবীর নিকট অবর্তীন হয়েছে সেভাষা অবশ্যই তাঁর মাতৃভাষায় হওয়া উচিৎ। যদি এটা বিদেশী ভাষায় অবতীর্ন হতো যে ভাষা নবীর জানা নেই তবে তারা যারা এই ভাষা নবীর চাইতেও বেশি জানতো তারা দাবী করতো আপনি যা বলছেন তা আপনার ভাষা নয় আমাদের ভাষা আপনার চাইতোমরা ভাল বুঝি। সুতরাং সাধারন দৃষ্টিতে এমন ভাষায় নাযিল হওয়া উচিৎ যেটা তারঁ মাতৃভাষা।

*জীবন্ত ও ব্যবহৃত ভাষা-

পাশাপাশি আরবী একটি চর্চিত ভাষা যে ভাষা মানুষ এখনও ব্যবহার করে। ১০০ কোটিরও বেশি লোক এই ভাষায় কথা বলে অন্য পক্ষে হিব্রু, সংস্কৃত ইত্যাদি মৃত ভাষা বর্তমানে কেউ এর ব্যবহার করেনা কিছু লোক ব্যতিত। কেউ যদি কুরআন পরিবর্তন করতে চায় তা হবে অসম্ভব কারন এটি জীবন্ত ভাষা, অন্য ধর্মের ভাষা বর্তমানে অব্যবহৃত।

*কুরআন একটি টেলিগ্রাফিক বার্তা-

আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ প্রতিটি শব্দের নিগুঢ় বিশ্লেষন আছে ও এর বিভিন্ন অর্থ বিদ্যমান। আরবী ভাষায় কুরআন হলো একটি টেলিগ্রাফিক বার্তা। সংক্ষিপ্ত আকারে এর বিশ্লেষন দাড়ায়ঁ অনেক বড়। আপনি হাজারবারও কুরআন পড়লে ক্লান্ত হবেনা কারন এর অর্থ ব্যাপক আপনি তা উপভোগ করবেন। এছাড়াও আরবীতে খুব সংক্ষিপ্ত শব্দ দিয়ে যেকোন কিছু বোঝানো যায় অন্য ভাষার চাইতেও তা লিখা এবং বলার ক্ষেত্রেও। যেমন একজন সার্জন যদি স্পেনের ভাষা না জানেন তবে সে উক্ত ভাষার অনুবাদ পড়ে সে বই থেকে জ্ঞান আহরন করবেন একইভাবে কুরআন সমগ্রজাতির জন্য যেহেতু নাযিল হয়ে যে কেউ আরবী শিখে কুরআন পড়তে পারে বা এর অনুবাদ পড়তে পারে।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন-১০: মুসলিমরা কেন এত ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে দিয়ে নির্দয়ভাবে পশু জবাই করে?

উত্তরঃ আলহামদুলিল্লাহ।

একটি বিরাট সংখ্যাক সমালোচনার বিষয় পশু জবাইয়ের ইসলামী পদ্ধতি। মুক্ত মনে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনলে প্রমাণ হয়ে যাবে জবাই পদ্ধতিটি শুধু মানবিকই নয় বৈজ্ঞানিকও বটে।

ক. পশু জবাই করার ইসলামী পদ্ধতি

'যাক্কায়াতুম' একটি ক্রিয়া, উৎপন্ন হয়েছে মূল শব্দ 'যাকাহ' থেকে (পবিত্র করতে)। এর ক্রিয়া ভাব প্রকাশক 'তাযকীয়াহ'। অর্থাৎ পবিত্রকরণ। ইসলামী পদ্ধতিতে একটি পশু জবাই করতে হলে নিম্নোদ্ধৃত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

১. সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করতে হবে

অত্যন্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে দ্রুততার সাথে পশুটি জবাই করতে হবে যেন ওটা ব্যাথা কম পায়।

২. গলনালী, শ্বাশ নালী ও রক্তবাহী ঘাড়ের রগ কেটে ফেলতে হবে

'যাবীহাহ্' একটি আরবী শব্দ যার মানে 'জবাই করা হয়েছে'। যবাই করতে হবে গলা, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের রক্তবাহী রগগুলো কেটে। মেরুদন্ডের তন্ত্রী (স্পাইনাল কড) কাটা যাবে না।

৩. শরীরের রক্ত প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করার আগে দেহের সমস্ত রক্ত বের করে দিতে হবে। অধিকাংশ রক্ত বের করে দিতে হবে এই জন্য যে, তা ব্যাকটেরিয়া ও জীবানু ইত্যাদির নিরাপদ নিবাস ও বংশ বিস্তারের ক্ষেত্র কাজেই মেরুদন্ডের তন্ত্রী কিছুতেই কাটা যাবে না। কেননা হৃদযন্ত্রের দিকে যেসব স্নায়ু তন্তু রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে

এসময়। যা হৃদপিন্ডের স্পন্দন থামিয়ে দেবার কারণ হবে। ফলে রক্ত নালীসমূহে রক্ত আটকা পড়ে যাবে।

খ. রক্ত, রোগ-জীবানু ও ব্যাকটেরিয়ার সহজ বাহন

জৈব-বিষ ব্যাকটেরিয়া ও রোগ-জীবানু ইত্যাদির সর্বোত্তম বাহক রক্ত। সুতরাং ইসলামী জবাই পদ্ধতি সাস্থ্যবিধি সম্মত। কেননা রক্ত, যার মধ্যে জৈব-বিষ, রোগ-জীবানু ও ব্যাকটেরিয়া বাসা বেধেঁ থাকে। যা অসংখ্য রোগ ব্যাধির কারণ হয়।

গ. গোস্ত বেশি দিন ভাল থাকে

পৃথিবীতে প্রচলিত খাদ্যের জন্য পশু হত্যার মধ্যে ইসলামী পদ্ধতীতে জবাই করা পশুর মাংস বেশিদিন ভালো থাকে। কেননা তাতে রক্তের পরিমাণ থাকে নাম মাত্র।

ঘ. পশু ব্যাথা অনুভব করে না

ক্ষীপ্রতার সাথে গলনালীগুলো কেটে ফেললে মস্তিষ্কের স্নায়ুতে রক্ত প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে রক্ত প্রবাহ ব্যাথা বোধের কারণ। একারণে পশু ব্যাথা বোধ করে উঠতে পারে না। মৃত্যুর সময় ওটা যে ছটফট করে তা ব্যাথার জন্য নয় বরং রক্তের ঘাটতি পড়ে যাওয়ায় মাংসপেশির শৈথিল্য ও সংকোচনের জন্য এবং দ্রুত গতিতে দেহের বাইরে যাবার কারণে

প্রশ্ন-১১: ইসলাম কি বহু খোদায় বিশ্বাস করে কারন অনেক স্থানে আমি-র পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তরঃ আলহামদুলিল্লাহ।

বহু ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে-

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনে আমরা শব্দটি ব্যবহার করেছেন তারমানে এই নয় তিনি বহু। ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে একটি হল পরিমান বোঝাতে আরেকটি হল সম্মানার্থে।

ইংরেজিতে ইংল্যান্ডের রানীকে আমরা বলে সম্মানার্থে সম্বোধন করা হয়। যা রাজকীয় মর্যাদা। ইন্ডিয়াতেও রাজিব গান্ধি বলেন-'হাম দেখনা চাতেহে' এখানে হাম মানে আমরা এটি সম্মানার্থে ব্যবহার হয়েছে। একইভাবে আরবীতে 'নাহনু' শব্দটি মর্যাদা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিস্বাসী-

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :-

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

" তিনি এক ও অদ্বিতীয়।"(সুরা ইখলাস-১)

প্রশ্ন-১২:আল্লাহ দয়ালু হলে জাহান্নাম কেন বানালেন?

উত্তর : ন্যায়বিচারক আল্লাহ তার নবীগণের কাছে পাঠানো ওহীর মাধ্যমে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। যেন মানুষ ভুল না করে। মুমিনের জন্য আল্লাহর ভয় হলো তার ঈমানকে মজবুত করার অংশ। আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, ভয় ও আশা তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাসের নামান্তর।

একজন মুমিন আল্লাহর পুরষ্কার ও শাস্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে জানে। সে জন্য আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিকটবর্তী হতে চায়। এভাবেই তার আত্মিক পরিশুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়।

সে আল্লাহর দেওয়া সীমা সমূহকে সম্মান করে, সচেষ্ট থাকে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে আল্লাহর রহমতের খোজ করে। কারণ এটি তাকে বিচার দিবসের ভয়াবহ অবস্থা ও জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করবে।

" যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাড়াতে ভয় করবে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত" (সুরা আর-রহমান:৪৬)

আল্লাহর বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল"(সূরা আল-ফাতির:২৮)

"মুমিন তো তারাই যারা প্রতিফল দিবস কে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত প্রকম্পিত। নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে আশংকা মুক্ত থাকতে পারে না।

(সূরা আল মাআরিজ: ২৬-২৮)

এ প্রসংগে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,মুমিনের হৃদয় যখন ভয় ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ তখন তার আশা পূরণ করেন। এবং সে যার ভয় করে তা থেকে তাকে রক্ষা করেন। (ইবনে মাজাহ)

আখিরাত অস্বীকারকারীরা বিচার দিবস এ জান্নাত জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করলে তাদের অবস্থা কেমন হবে?

তারাই সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের নিজেদের ও পরিবারের ব্যাপার এ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের জন্য উপর ও নীচ হতে আগুনের জ্বালা থাকবে। এ শাস্তির দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদের সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দারা আমাকে ভয় কর।" (সূরা আয-যুমার:১৫-১৬)

প্রশ্ন-১৩:আল্লাহ যত নবী পৃথিবীতে প্রেরন করেছেন,তাদেঁর মধ্যে একজনও কেন মহিলা নেই? পুরুষকে কেন নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্।

দায়িত্বের সমবন্টন ও ন্যায়বিচার-

সাধারন মানুষের চাইতে নবীগনের বেশি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং তা সমাধান করতে হয়। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়-

* নবীকে নামাযে ইমামতি করতে হবে যদি মহিলা ইমাম হয় আর পুরুষরা পেছনে থাকে তাহলেই আল্লাহর দিকে মনোযোগের চাইতে উক্ত মহিলার দিকে মনোযোগ বেশি যাবে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান সেটাই প্রমান করে।

* পয়গম্বরকে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে হয়। হাত মেলাতে হয় যা শরিয়া অনুযায়ী নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, একজন পুরুষ নবী সহজে করতে পারে।

*নবীকে অনেক মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে যা নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

*সরকার প্রধান যদি মহিলা হয় তাহলে বিভিন্ন সময় ব্যক্তিবর্গের সাথে রুদ্ধদ্বার ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা করতে হয় যা ইসলামের আইনের খেলাফ।

*এছাড়া নারীগনকে বাচ্চা ১০ মাস ১০দিন গর্ভে ধারন করতে হয়। সংসার ছেলে-মেয়ে দেখাশুনা করতে হয় তার উপর যদি নবীর দায়িত্ব এলে তাহলে তা অবিচার হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন-

‘‘আমি ন্যায়বিচারক ও দয়ালু,

আল্লাহ নারীগনকে পবিত্র কুরআন অনেক সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে বিবি মারিয়ম (আঃ) তিনি সমস্ত পৃথিবীর নারীশ্রেষ্ঠা, হযরত আয়েশা হযরত ফাতেমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহতাআলা দায়িত্বের সমবন্টন করার ক্ষেত্রেই নারীগনকে নবী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠাননি।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন-১৪:যদি আল্লাহর ইচ্ছাই সব হয়ে থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই?

উত্তর :- আলহামদুলিল্লাহ্

আল্লাহ বলেন-

"একটি পাতাও পড়েনা আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া। সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে।"

আমৃত্যু স্বাধীন ইচ্ছা,একটা পরীক্ষা।

তবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইচ্ছা আছে উদাহরনস্বরুপ বলা যায়,

ধরুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে আপনার বাড়ি তথা প্রত্যেক এলাকার বিদ্যুৎ আসে। যদি কেউ নিজের আঙ্গুল কারেন্টের লাইনে রাখে সে ধাক্কা খাবে।

এটা তার দোষ, আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন সে ইচ্ছে করলে বিদ্যুৎ হাত দেবে আর ইচ্ছা না করলে দেবেনা।

কিন্তু তার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দায়ী করা যাবেনা সুতরাং দোষটা পড়ে পুরোপুরি মানুষের- কেন সে বিদ্যুতে হাত দিলো?

আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন কারন প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা এক একটা পরীক্ষা।

জীবন পদ্ধতির সঠিক নিয়ম-কানুন-

আল্লাহ পবিত্র কুরআন ও রাসূল ﷺ জীবনাদর্শে প্রকাশ করেছেন। সে যদি অনুসরন করে যত বছরই সে বেচে থাকুক ২০ বছর ৫০ বছর ১০০ বছর তার জীবন পদ্ধতির ও স্বাধীন ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই বিচারের ফলাফল আল্লাহ প্রকাশ করবেন। আর সে যদি সেভাবে অনুসরন না করে সে অকৃতকার্য, আল্লাহ বলেন সুরা মুলক-৬৭: আয়াত-২-

" যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের যাচাই করতে যে তোমাদের মধ্যে কে কাজেকর্মে শ্রেষ্ঠ।'

আল্লাহ বলেন– সুরা আনকাবুত ২৯: ২-৭

(২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

(৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।

(৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ।

(৫) যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে বেপরোয়া।

(৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজ গুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।

আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন।

দাওয়াহ দেয়ার পদ্ধতি

কথোপকথন-১

স্রষ্টা যদি সব সৃষ্টি করেন,স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করল?

শাহরিয়ার:হাই মাহমুদ ভাই!কেমন আছেন?

মাহমুদ:আলহামদুলিল্লাহ ভাই

শাহরিয়ার:এই যে আপনাদের মতো মৌলবাদি মানুষেরা সব কথায় আল্লাহকে টেনে আনেন,আচ্ছা বলেন তো সব যদি সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টি করে থাকেন তবে তাকে কে সৃষ্টি করল?

মাহমুদ:স্রষ্টা নিজেই এমন এক সত্তা যিনি সৃষ্ট নন, তিনি অস্তিত্বে আসেন নি বরং সর্বদা অস্তত্বিশীল এবং তিনি সৃষ্টিজগতের স্থান-কাল কাঠামোর অংশ নন । আর এজন্যই তিনি অসৃষ্ট বা অবস্তু, ফলে তাঁর সৃষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই ।

শাহরিয়ার:যদি স্রষ্টাকে অস্তিত্বে আনার প্রয়োজন নেই বলে ধরে নেই, তবে খোদ মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেই একথা ধরে নেই না কেন ?

মাহমুদ:এই মহাবিশ্ব কোন জ্ঞানসম্পন্ন সত্তা নয় যে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, পরিচালনা করতে পারে। বরং মহাবিশ্বের সকল ব্যবস্থা ও সকল অংশ ইংগিত করছে যে, তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এজন্য কোন স্রষ্টা ব্যতীত মহাবিশ্বের স্বয়ংসর্ম্পূণ অস্তিত্বের ধারণা যৌক্তিক নয়, তাই এক্ষেত্রে একমাত্র যৌক্তিক সম্ভাবনা হচ্ছে এই যে, এর একজন জ্ঞানী স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী থাকতে হবে যিনি নিজে সৃষ্ট নন।

শাহরিয়ার:হুম...

মাহমুদ:স্রষ্টা নিজেই কুরআনে তার পরিচয় দিয়েছেন

কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ

আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।

(সূরা ইখলাস:১-৪)

কথোপকথন-২

আল্লাহ রিজিকদাতা হলে মানুষ না খেয়ে মারা যায় কেন?

নিলয়:হাই উবাইদাহ,কেমন আছিস বন্ধু?

উবাইদাহ:আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তুই কেমন আছিস?

নিলয়:ভালো,আচ্ছা উবাইদাহ তুই তো খুব ধার্মিক একটা প্রশ্ন করি।আল্লাহই যদি রিজিকদাতা হয় তাহলে এই যে আমরা দেখি কত মানুষ না খেয়ে আছে বা মানুষ না খেয়ে মারা যায় কেন?

উবাইদাহ:রিজিকের মালিক আল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নেই।আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করার আরো বহু বছর আগেই তাকদীরে সব লিখে রেখেছেন

নিলয়:আচ্ছা তাই যদি হয় তবে যারা খাবার না খেয়ে মারা যায় তাদের তাকদিরে রিজিক ছিল না??

উবাইদা:আচ্ছা শুন,

ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার রয়েছে।এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে--

আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।(সূরা যারিয়াত-১৯)।

রিজিকের জন্য নিজেদেরও চেষ্টা পরিশ্রম করতে হবে।আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন–

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

অর্থ:তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।(সূরা-মূলক:১৫)

আল্লাহ মানুষকে রিজিক দিয়েও পরীক্ষা করেন।

নিলয়:কিভাবে রিজিক দিয়ে পরীক্ষা করেন?

উবাইদাহ:হ্যা,রিজিক এক ধরনের পরীক্ষা।আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনে আমাদেরকে অনেক কিছুর দ্বারাই পরীক্ষা করে থাকেন, আমরা আসলে কতটা ঈমান রাখি আল্লাহর উপর।

এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ

অর্থ:আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।(সূরা-বাকারাহ-১৫৫)

নিলয়:বুঝলাম,কিন্তু রিজিক যদি নির্ধারিতই থাকে তাহলে কাজ করার আবশ্যকতা কি?

উবাইদাহ:ইসলাম কখনোই বলে না মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকুক এমনিতেই রিজিক আসবে।

নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।(সূরা-রাদ:১১)

নিলয়:আচ্ছা এখন আমার একটু তাড়া আছে রে আসি।

কথোপকথন-৩

ইসলামে মহিলারা কেন একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না?

লিনা:হাই ফাতেমা!দিনকাল কেমন যাচ্ছে?শুনলাম তোমার নাকি বিয়ে হয়েছে!

ফাতেমা:জ্বি আলহামদুলিল্লাহ,কিছুদিন আগেই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় বিয়ে হলো।

লিনা:আচ্ছা ফাতেমা,ইসলাম ধর্মে একই সময়ে একজন পুরুষ নাকি একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে তাই না?

ফাতেমা:হ্যা,আলহামদুলিল্লাহ

লিনা:তবে একই সময়ে একজন নারী কেন একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না।তোমাদের ধর্মে তো নাকি খুব ইনসাফ করে কিন্তু এক্ষেত্রে কিভাবে ইনসাফ হলো!!

ফাতেমা:আল্লাহ তায়ালা ইসলামে মহিলাদেরকে একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিয়ের অনুমতি দেন নি এর মধ্যে অনেক হিকমাহ(প্রজ্ঞা) রয়েছে।

এজন্য দেখা যায় যে,পৃথিবীতে মুসলিম নারীর চেয়ে পবিত্র ও বিশুদ্ধ নারী অন্য কোন ধর্মে নেই।

একজন পুরুষের একধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মাতা-পিতার পরিচয় খুব সহজেই পাওয়া যায়। শিশুর পিতা কে আর মাতা কে। অপরদিকে একজন নারী যদি একাধিক স্বামী গ্রহণ করে তবে এ পরিবার জন্ম নেয়া শিশুর শুধু মায়ের পরিচয় পাওয়া যাবে-বাবার নয়। পিতা ও মাতার সুস্পষ্ট পরিচয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম আপোসহীন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানিরা বলেন, যে শিশু তার মাতা-পিতার পরিচয় জানে না, বিশেষ করে পিতার- সে শিশু তীব্র মানসিক জটিলতা ও হীনমন্যতায় ভোগে।

ইসলামে কোনো তালাক প্রাপ্ত নারীকেও দ্বিতীয় বিয়ের পূর্বে তিন মাসের একটি গ্যাপ রাখতে বলেছেন।এর পিছনেও হিকমাহ(প্রজ্ঞা) রয়েছে।

লিনা:আচ্ছা তো এর পিছনে কি প্রজ্ঞা আছে শুনি।

ফাতেমা:আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন–

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।"(সূরা আল-বাকারাহ:২২৮)

তুমি তো বিজ্ঞানে বিশ্বাস করো তাই না!!

বর্তমান বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছে যে–

প্রথম মাসিক আসার পর একজন মহিলার শরীর থেকে (৩২%-৩৫%)পর্যন্ত প্রোটিন শেষ হয়ে যায়,

এবং দ্বিতীয় মাসিক আসার পর তার শরীর থেকে (৬৭-৭২%) ডিএনএ ধ্বংস হয়ে যায়।

আর তৃতীয় মাসিকের পর ৯৯.৯% পর্যন্ত প্রোটিন নির্মূল হয়ে যায়। এরপর জরায়ু আগের ডিএনএ থেকে সম্পন্নরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং কোন প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই নতুন ডিএনএ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

এজন্য যদি একই সাথে একাধিক পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে, তাহলে তার শরীরে বিভিন্ন ধরণের ডিএনএ জমা হয় যা বিপজ্জনক ভাইরাসের রূপ নেয় এবং মারাত্মক রোগ সৃষ্টির কারণ হয়।

বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান একটু ভিন্ন।

ইসলামে বিধবা মহিলার ইদ্দত তালাকপ্রাপ্ত মহিলার চেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪ মাস ১০ দিন।

লিনা:বিধবা মহিলার জন্য ভিন্ন কেন??

ফাতেমা:এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা হলো দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণে তার শরীর থেকে প্রাক্তন স্বামীর ডিএনএ দ্রুত শেষ হয় না।

এটি শেষ হতে আগের চেয়ে বেশি সময় লাগে, এ জন্য ইসলামে বিধবা মহিলাদের ইদ্দত ৪মাস ১০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে।"(আল-বাকারাহ, ২৩৪)

তাই ইসলামে একজন মহিলার জন্য একই সময়ে একাধিক বিয়ে বা একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি।

লিনা:হুম বুঝলাম.আচ্ছা পরে কথা হবে,ধন্যবাদ।

কথোপকথন-৪

আল্লাহ যদি অভাবগ্রস্থ না হন তাহলে ঋন চাইলেন কেন?

সামির:আচ্ছা রাহাত,স্রষ্টার কাছে তো নাকি কোনো কিছুর অভাব নেই তবে তিনি মানুষের কাছে ঋন চেয়েছেন কেন?

রাহাত:আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সূরা বাকারাহ-২৪৫ নং আয়াতে বলেছেন-

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অর্থ:কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।

আবার সূরা হাদিদের **১১** নং আয়াতেও আছে–

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ

অর্থ:এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম করয দিবে ? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।

এমন আরো কিছু আয়াতে আল্লাহ একথা বলেছেন।তুই এগুলো আয়াত পড়ে ভাবছিস আল্লাহ অভাবগ্রস্থ কিনা!!

সামির:হ্যা,আয়াত গুলো দ্বারা তো এটাই মনে হচ্ছে।

রাহাত:এখানে আল্লাহকে ঋন দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর রাস্তায় দান করা।আল্লাহ কখনোই আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন,বরং আমাদের যে সম্পদ রয়েছে সবকিছু আল্লাহরই দেওয়া রিজিক।

আল্লাহ সুবহানুতায়ালা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ

অর্থ:হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।(সূরা-ফাতির-**১৫**)

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

অর্থ:আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।(সূরা-ইখলাস:২)

সামির:তাহলে সরাসরি দান করার কথাই বলতে পারত ঋনের কথা বললেন কেন?

রাহাত:এটা আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ার তিনি তার বান্দাদের উৎসাহিত করার জন্য এমন শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন।পৃথিবীর সমস্ত কিছুই আল্লাহর দেয়া উনার আমাদের

সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই।আমরা যদি দান করি তবে আমরা তো নিজেকে এবং অন্যকেই উপকৃত করে থাকি।

সামির:আমার বুঝে হয়ত ভুল ছিল আমি সরাসরি অর্থ থেকে বুঝতে চেয়েছিলাম,ব্যাখ্যা জানা ছিল না,ধন্যবাদ

কথোপকথন-৫

কুরআনের মতো কোনো বই নাকি লেখা সম্ভব না?

মিরা: কেমন আছো নাফিসা?

নাফিসা:আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তুমি কেমন আছো?

মিরা:ভালো,আচ্ছা নাফিসা কুরআনের মতো কোনো বই নাকি লিখা সম্ভব না এর কি কোনো যুক্তি প্রমান তোমার জানা আছে?

নাফিসা:কুরআনের সমতুল্য কোন বই এই পৃথিবীতে নাই । কুরআন রয়েছে অসংখ্য মিরাকল। কুরআনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন আয়াত, কুরআনের বিভিন্ন ভবিষ্যৎবানী, কুরআনের শব্দবিন্যাস, আরবী ভাষার উপর কুরআনের প্রভাব, কুরআন যেভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে – এই প্রত্যেকটা ব্যাপারই ইউনিক। পৃথিবীর আরো কোন বইয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নাই।

মিরা:এর কোনো যুক্তি প্রমান কি তোমার জানা আছে? এটা সাধারণ বইয়ের মতোই কি এমন আছে যার ফলে এটা ঐশ্বরিক বানী মনে করো তোমরা?

নাফিসা:আয়াতের দিক থেকে কুরআনের অন্যতম ছোট সূরা হলো সূরা ইখলাস। প্রায় ১৪০০ বছর আগের সেই দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ এই সূরাটি পড়েছে, পড়ছে, মুখস্থ করেছে, করছে, ঠিক সেই উচ্চারণে যেই উচ্চারণে এটি প্রথমবার মানুষ শুনেছিলো।

এখন কেউ পারলে এরকম চারটি লাইন অন্য কোনো বই থেকে এনে দেখান যেটা হাজার বছর ধরে মানুষ এত গুরুত্বের সাথে আমল করছে।

এই চ্যালেঞ্জ কার্যকর কেউই করতে পারবে না।

মিরা: তাহলে তুমি বলতে চাইছ কুরআনের যে বানী আছে এর মতো কিছু লিখা মানুষের পক্ষে সম্ভব না!এটা তোমাদের নবির লিখা বই না?

নাফিসা: না কুরআন সম্পূর্ন ঐশ্বরিক কিতাব স্বয়ং কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

অর্থ:নাকি তারা বলে, ‘সে মুহাম্মাদ (সাঃ) তা বানিয়েছে’? বল, ‘তবে তোমরা তার মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’।(সূরা ইউনুস:৩৮)

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

অর্থ:”আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।”(সূরা বাকারাহ:২৩)

মিরা:হুম বুঝলাম..

কথোপকথন-৬

ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম কেন?

আদিত্য:কেমন আছেন তামিম ভাই?

তামিম:আলহামদুলিল্লাহ,আপনি কেমন আছেন?

আদিত্য:জ্বি ভালো আছি।

আপনাকে দাওয়াত আমাদের সামনে একটা পার্টি আছে,আমরা বন্ধুরা মিলে আমাদের স্পেশাল ডিশ বানাবো।

তামিম:আচ্ছা কি তোমাদের স্পেশাল ডিশ?

আদিত্য:আমরা বড় একটা শূকর ধরে এনেছি এটাকে বার-বি-কিউ করব।

তামিম:মাআযাল্লাহ(আল্লাহর পানাহ চাই)আমি তো শূকর খাই না,ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম।

আদিত্য:আচ্ছা ভাই ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম কেন?

তামিম:মহান প্রতিপালক আমাদের জন্য শূকর খাওয়া অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ:“বল, ‘আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোস্ত হয়- কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র কিংবা এমন অবৈধ যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”(সূরা আনআম-১৪৫)

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

অর্থ:"যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।"(সূরা আরাফ-১৫৭)

আদিত্য:শূকর তো আল্লাহরই সৃষ্টি তবে..

তামিম:শূকর নাপাক ও নিকৃষ্ট প্রানী এ ব্যাপারে আমরা এক মূহুর্তের জন্যও সন্দেহ পোষণ করি না।

শূকর ময়লা আবর্জনা খেয়ে জীবন ধারন করে।

এর গোশত মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক,বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগ সৃষ্টির কারন হতে পারে।

আদিত্য: তবে সৃষ্টিকর্তা শূকর সৃষ্টি করলেনই কেন?

তামিম:আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে এমন অনেক কষ্টদায়ক বা অপবিত্র বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং এর পিছনে অনেক হিকমাহ (প্রজ্ঞা) রয়েছে।

আদিত্য:তাহলে এটাকে মানুষের জন্য হারাম কেন করেছেন?

তামিম:সৃষ্টিকর্তার এই অধিকার অবশ্যই রয়েছে যে তিনি তার বান্দাদের যা খুশি নির্দেশ করবেন,এ ব্যাপারে সমালোচনার অবকাশ নেই।

তাই মাখলুক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো শুনলাম এবং মানলাম।

কথোপকথন-৭

আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান এবং পরম করুনাময় হন, তাহলে পৃথিবীতে এতো দুঃখ-কষ্ট কেন?

নীলা:হাই,কেমন আছিস খাদিজা?

খাদিজা:আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তুই কেমন আছিস?

নীলা:ভালো আছি,আচ্ছা খাদিজা -আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান আর পরম করুনাময় হয়ে থাকেন তবে পৃথিবীতে এতো দুঃখ কষ্ট কেন বলতে পারো?

খাদিজা:পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট থাকলেও পৃথিবীতে অনেক আনন্দও আছে। বরং, পৃথিবীতে আনন্দই বেশী, নাহলে অধিকাংশ মানুষ বেঁচে থাকতে চাইত না।

নীলা:তোর কাছে মনে হয় আনন্দ বেশি?

খাদিজা:অবশ্যই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অর্থ:বলুন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে? বলুন, এসব তো ঈমানদারদের জন্য – পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে।এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য, যারা জানে।

(সূরা আ'রাফ:৩২)

নীলা:দুঃখবোধও অনেক আছে যা সহ্য করতে না পেরে মানুষ আত্নহত্যাও করে এটাকে তুই কিভাবে নিবি!

খাদিজা:আমরা যতটুকু সহ্য করতে পারব ততটুকু বোঝাই আল্লাহ আমাদের উপর দেন এর বেশি না।দেখ আল্লাহ কুরআনে সূরা বাকারাহর ২৮৬ নং আয়াতে বলেছেন-

"আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"

নীলা:হুম...

খাদিজা: আল্লাহ্ আমাদের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেন, যাতে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি এবং কঠিনতর পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি।

“তিনি (আল্লাহ্) বললেন: আমি যা জানি তোমরা তা জান না।” (সূরা বাক্বারাহ্:৩০)।

এই পৃথিবীটা হলো একটা পরীক্ষার জায়গা। আল্লাহ্ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করছেন। এই পরীক্ষা আনন্দদায়ক হতে পারে, আবার কষ্টেরও হতে পারে।

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদের (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর (কাউকে) ধনেপ্রাণে বা ফলফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব। আর যারা ধৈর্য ধরে তাদের তুমি সুখবর দাও। (তারাই ধৈর্যশীল) যাদের ওপর কোন বিপদ এলে বলে,

নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তারই দিকে ফিরে যাব’। এদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হয় এবং এরাই সুপথগামী”(সূরা-বাক্বারাহ:১৫৫-১৫৭)

নীলা:তোর কথা মতো পরীক্ষা তো বুঝলাম তবে এতো কঠিন কেন?

খাদিজা:শুন তোর এই প্রশ্নের উত্তরও আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন কুরআনে—

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ

অর্থ:"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।"(সূরা মুলক-২)

"আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়; আর সাবধানীদের জন্য পরকালের আবাসই ভালো; তোমরা কি বোঝ না?" – (সূরা আন'আম:৩২)

নীলা:আচ্ছা তোর কথা আমি ভেবে দেখব।

খাদিজা:এগুলো আমার কথা না কুরআনের কথা

নীলা:আচ্ছা যাই হোক এখন আসি..পরে কথা হবে।

কথোপকথন:৮

স্রষ্টার কি অস্তিত্ব আছে?

রাজিব:মুনতাসির কেমন আছো?

মুনতাসির:আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তুমি কেমন আছো?

রাজিব:ভালো আছি,মুনতাসির তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম।

মুনতাসির:জ্বি অবশ্যই করো।

রাজিব:চলো অফিসের করিডোরে গিয়ে বসে কথা বলা যাক।

মুনতাসির:জ্বি চলুন।

রাজিব:আচ্ছা মুনতাসির তুমি তো মুসলিম, তুমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করো?

মুনতাসির: হ্যা,আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি।

রাজিব: তুমি কি কখনো তাকে দেখেছো?

মুনতাসির: না,আমি তাকে কখনো দেখি নি।

রাজিব: তুমি কি কখনো তার কথা শুনেছ?

মুনতাসির: না,আমি তার কথা কখনো শুনি নি।

রাজিব:তুমি কি তাকে কখনো স্পর্শ করেছো?

মুনতাসির:না,আমি তাকে কখনো স্পর্শ করি নি।

রাজিব:তাহলে তা োমার রব আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই,কারণ তুমি যাকে কখনো দেখো নি, যার কথা কখনো শুনো নি, যাকে কখনো স্পর্শ করোনি তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

মুনতাসির:তোমার কি আকল (বিবেক-বুদ্ধি) আছে?

রাজিব:হ্যা আছে।

মুনতাসির:তুমি কি তোমার বিবেককে কখনো দেখেছেন?

রাজিব: না, আমি তা কখনো দেখি নি।

মুনতাসির:তুমি কি এর কথা কখনো শুনেছ?

রাজিব:না আমি এর কথা কখনো শুনি নি।

মুনতাসির:তাহলে তো বলতে হয় তোমার কোনো বিবেক নেই।

রাজিব:না,অবশ্যই আমার বিবেক আছে।

মুনতাসির:তুমি কীভাবে জানলে যে,তোমার বিবেক(আকল) আছে?

রাজিব: আমি এর প্রভাব টের পাই। অর্থাৎ এর বিভিন্ন নিদর্শন থেকে আমি আমার আকলের(বিবেক) অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি, তাহলে কীভাবে বলবো যে, আমার কোনো বিবেক নেই?

সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নিদর্শন দেখে বুঝবে যে, তার জ্ঞান আছে। যখন দেখা যাবে, সে সবকিছু সঠিকভাবে সম্পাদন করছে, ভুল কিছু করছে না।তখন মানুষ তাকে বলবে, সে জ্ঞানী।তার বিবেক-বুদ্ধি ঠিক আছে।

তুমি আমাকে বলো—আমরা কীভাবে জানবো যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে?

মুনতাসির: আমরা তাঁর নিদর্শন দেখে, তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি দেখে; আসমান, যমিন, পাহাড়-পর্বত দেখে এবং আমাদের নিকট যে অবিকৃত কুরআন আছে, এ-মুজিযা দেখে জানতে পারবো যে, আল্লাহ আছেন। আর এসবকিছুই বলে দেয় যে, এক আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর মহাসত্তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন—

اَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.

অর্থ:“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ব্যাপারে কি তোমরা সন্দেহের মধ্যে রয়েছ?” (সূরা ইবরাহীম - ১০)

আল্লাহ তাআলা মহাজগতে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণকারী নিদর্শনাবলির প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন—

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ،الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰي جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ،رَبَّنَاۤ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

অর্থ:“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে অবশ্যই নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বশয়নে আল্লাহকে স্মরণ করে। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র মহান। তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো জাহান্নামের শাস্তি থেকে”

(সূরা আলে ইমরান: ১৯০-১৯১)

বিশ্বাসীগণের বিবেকের কাছে এ প্রশ্ন রেখে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে—

وَ فِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ،وَ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ، وَ فِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوْعَدُوْنَ.

অর্থ:“আর বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে আমার নিদর্শনাবলি এবং স্বয়ং তোমাদের মাঝেও। সুতরাং তোমরা কি অনুধাবন করবে না? আকাশে বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণ ও তোমাদেরকে যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।” (সূরা যারিয়াত : ২০-২১)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বহু আয়াতে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন।

রাজিব:হুম..চলো এখন উঠা যাক কাজের সময় হয়ে গিয়েছে।

কথোপকথন-৯

কুরআন আরবীতে কেন নাযিল হয়েছে?

রনি:হ্যালো মুহিব,কেমন আছো?

মুহিব:আলহামদুলিল্লাহ ভালো,তুমি কেমন আছো?

রনি:ভালো আছি,আচ্ছা পৃথিবীতে এতো এতো ভাষা থাকতে কুরআন আরবী ভাষায় কেন নাযিল করা হয়েছে?

মুহিব:পবিত্র কুরআন যদিও এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং তা প্রকাশ হয়েছে আরবী ভাষায় কারন:

আরবের ভাষা আরবী, অতএব নাযিলকৃত বানীও হওয়া উচিৎ সে দেশের ভাষায়। এটা অন্য ভাষায় নাযিলের যুক্তিকতা নেই। একইভাবে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল হিব্রু ভাষায় নাযিল হয়েছে কারন সে স্থানের ভাষা ছিল হিব্রু।

যেহেতু এটি মোহাম্মদ (ﷺ) বা সর্বশেষ নবীর নিকট অবতীর্ন হয়েছে সে ভাষা অবশ্যই তাঁর মাতৃভাষায় হওয়া উচিৎ। যদি এটা বিদেশী ভাষায় অবতীর্ন হতো যে ভাষা নবীর জানা নেই তবে তারা যারা এই ভাষা নবীর চাইতেও বেশি জানতো তারা দাবী করতো আপনি যা বলছেন তা আপনার ভাষা নয় আমাদের ভাষা আপনার চাইতোমরা ভাল বুঝি। সুতরাং সাধারন দৃষ্টিতে এমন ভাষায় নাযিল হওয়া উচিৎ যেটা তারঁ মাতৃভাষা।

রনি:অন্য দেশীয় মানুষদের জন্য তো তাহলে কঠিন হলো।

মুহিব:না আলহামদুলিল্লাহ। আরবী হলো জীবন্ত ও ব্যবহৃত ভাষা।পাশাপাশি আরবী একটি চর্চিত ভাষা যে ভাষা মানুষ এখনও ব্যবহার করে। ১০০ কোটিরও বেশি লোক এই ভাষায় কথা বলে অন্য পক্ষে হিব্রু, সংস্কৃত ইত্যাদি মৃত ভাষা বর্তমানে কেউ এর ব্যবহার করেনা কিছু লোক ব্যতীত। কেউ যদি কুরআন পরিবর্তন করতে চায় তা হবে অসম্ভব কারন এটি জীবন্ত ভাষা, অন্য ধর্মের ভাষা বর্তমানে অব্যবহৃত।

রনি:এ ভাষার কেমন ধরনের বার্তা দেয় পাঠককে?

মুহিব:এটি একটি ব্যপ্ত ও বিস্তৃত ভাষা এবং অল্প কথায় এতে অনেক কিছু বোঝানো সম্ভব। প্রতিটি শব্দের নিগুঢ় বিশ্লেষন আছে ও এর বিভিন্ন অর্থ বিদ্যমান। আরবী ভাষায় কুরআন হলো একটি টেলিগ্রাফিক বার্তা। সংক্ষিপ্ত আকারে এর বিশ্লেষন দাড়ায়ঁ অনেক বড়। আপনি হাজারবারও কুরআন পড়লে ক্লান্ত হবেনা কারন এর অর্থ ব্যাপক পাঠক তা উপভোগ করবে। এছাড়াও আরবীতে খুব সংক্ষিপ্ত শব্দ দিয়ে যেকোন কিছু বোঝানো যায় অন্য ভাষার চাইতেও তা লিখা এবং বলার ক্ষেত্রেও। যেমন একজন সার্জন যদি স্পেনের ভাষা না জানেন তবে সে উক্ত ভাষার অনুবাদ পড়ে সে বই থেকে জ্ঞান আহরন করবেন একইভাবে কুরআন সমগ্রজাতির জন্য যেহেতু নাযিল হয়ে যে কেউ আরবী শিখে কুরআন পড়তে পারে বা এর অনুবাদ পড়তে পারে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

"আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?"(সূরা কমার:৪০)

রনি:ধন্যবাদ তোমাকে অনেক কিছু জানলাম।

কথোপকথন-১০

মুসলিমরা কেন এত ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে দিয়ে নির্দয়ভাবে পশু জবাই করে?

নয়ন:কিরে আরিফ, কোথায় যাচ্ছিস?

আরিফ:সামনে কুরবানীর ঈদ গরু কিনতে হাটে যাচ্ছি।

নয়ন:তোরা মুসলিমরা কেন এত ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে দিয়ে নির্দয়ভাবে পশু জবাই করিস?

আরিফ:আসলে সঠিক ধারনা না থাকার কারনে এমন ভুল ধারণা করে এক শ্রেণির মানুষ। কিছু বিষয় বিবেচনায় আনলে প্রমাণ হয়ে যাবে আমাদের জবাই পদ্ধতিটি শুধু মানবিকই নয় বৈজ্ঞানিকও বটে।

পশু জবাই করার ইসলামী পদ্ধতি

'যাক্কায়াতুম' একটি ক্রিয়া, উৎপন্ন হয়েছে মূল শব্দ 'যাকাহ' থেকে (পবিত্র করতে)। এর ক্রিয়া ভাব প্রকাশক 'তাযকীয়াহ'। অর্থাৎ পবিত্রকরণ। ইসলামী পদ্ধতিতে একটি পশু জবাই করতে হলে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

নয়ন:বৈজ্ঞানিক!!

আরিফ:হ্যা,শোন তবে-

*সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করতে হবে

অত্যন্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে দ্রুততার সাথে পশুটি জবাই করতে হবে যেন পশুটি ব্যাথা কম পায়।

*গলনালী, শ্বাসনালী ও রক্তবাহী ঘাড়ের রগ কেটে ফেলতে হবে।

'যাবীহাহ্' একটি আরবী শব্দ যার মানে 'জবাই করা হয়েছে'। যবাই করতে হবে গলা, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের রক্তবাহী রগগুলো কেটে। মেরুদন্ডের তন্ত্রী (স্পাইনাল কড) কাটা যাবে না।

*শরীরের রক্ত প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করার আগে দেহের সমস্ত রক্ত বের করে দিতে হবে। অধিকাংশ রক্ত বের করে দিতে হবে এই জন্য যে, তা ব্যাকটেরিয়া ও জীবানু ইত্যাদির নিরাপদ নিবাস ও বংশ বিস্তারের ক্ষেত্র কাজেই মেরুদন্ডের তন্ত্রী কিছুতেই কাটা যাবে না। কেননা হৃদযন্ত্রের দিকে যেসব স্নায়ু তন্তু রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে এসময়। যা হৃদপিন্ডের স্পন্দন থামিয়ে দেবার কারণ হবে। ফলে রক্ত নালীসমূহে রক্ত আটকা পড়ে যাবে।

নয়ন:এসব তো জানা ছিল না।

আরিফ:আর রক্ত, রোগ-জীবানু ও ব্যাকটেরিয়ার সহজ বাহন,

জৈব-বিষ ব্যাকটেরিয়া ও রোগ-জীবানু ইত্যাদির সর্বোত্তম বাহক রক্ত। সুতরাং ইসলামী জবাই পদ্ধতি স্বাস্থ্যবিধি সম্মত। কেননা রক্ত, যার মধ্যে জৈব-বিষ, রোগ-জীবানু ও ব্যাকটেরিয়া বাসা বেধেঁ থাকে। যা অসংখ্য রোগ ব্যাধির কারণ হয়।

নয়ন:এভাবে জবাইয়ের সময় তো ব্যাথা খুব অনুভব করে পশুরা।

আরিফ:পশু ব্যাথা অনুভব করে না,ক্ষীপ্রতার সাথে গলনালীগুলো কেটে ফেললে মস্তিষ্কের স্নায়ুতে রক্ত প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে রক্ত প্রবাহ ব্যাথা বোধের কারণ। একারণে পশু ব্যাথা বোধ করে উঠতে পারে না। মৃত্যুর সময় ওটা যে ছটফট করে তা ব্যাথার

জন্য নয় বরং রক্তের ঘাটতি পড়ে যাওয়ায় মাংসপেশির শৈথিল্য ও সংকোচনের জন্য এবং দ্রুত গতিতে দেহের বাইরে যাবার কারণে।

নয়ন:যাক কিছু অজানা বিষয় জানা গেল,ধন্যবাদ।

কথপোকথন-১১

ইসলাম কি বহু খোদায় বিশ্বাস করে কারন অনেক স্থানে আমি-র পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে?

জোহান: হাই জুবায়ের! কেমন আছিস?

জুবায়ের: আলহামদুলিল্লহ, আল্লাহ ভালো রেখেছেন।

জোহান: কয়জন আল্লাহ মিলে ভালো রেখেছেন তোকে?

জুবায়ের: আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

জোহান: তোরা কি বহু খোদায় বিশ্বাসী?

জুবায়ের: আস্তাগফিরুল্লাহ! আমাদের সৃষ্টিকর্তা কেবল একজন। তার কোনো শরিক নেই।

জোহান: তাহলে কুরআনের বহু স্থানে অনেক স্থানে আমি-র পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে?

জুবায়ের: বহু ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে-

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ নিজেই পবিত্র কুরআনে আমরা শব্দটি ব্যবহার করেছেন তারমানে এই নয় তিনি বহু। ভাষায় দু'ধরনের বহুবচন আছে একটি হল পরিমান বোঝাতে আরেকটি হল সম্মানার্থে।

ইংরেজিতে ইংল্যান্ডের রানীকে আমরা বলে সম্মানার্থে সম্বোধন করা হয়। যা রাজকীয় মর্যাদা। ইন্ডিয়াতেও রাজিব গান্ধি বলেন-'হাম দেখনা চাতেহে' এখানে হাম মানে আমরা এটি সম্মানার্থে ব্যবহার হয়েছে। একইভাবে আরবীতে 'নাহনু' শব্দটি মর্যাদা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইসলাম এক সৃষ্টিকর্তায় বিস্বাসী-

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :-

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

অর্থাৎ তিনি এক ও অদ্বিতীয়। (সুরা ইখলাস-১)

জোহান: ওহ আচ্ছা। এটা তো এতদিন জানতাম ই না।

ইসলাম ধর্ম নিয়ে আরো জানার চেষ্টা করবো।

জুবায়ের: যেকোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে জানাবেন ইন শা আল্লাহ্।

কথোপকথন-১২

আল্লাহ দয়ালু হলে জাহান্নাম কেন বানালেন?

রবিন: হাই! আব্দুল্লাহ কোথায় যাচ্ছো?

আব্দুল্লাহ : মসজিদে যাচ্ছি। নামায পড়তে হবে।

রবিন : মসজিদে যেতে হবে না। চল সিনেমা দেখতে যায়।

আব্দুল্লাহ : না যাব না ভাই। নামায না পড়লে পরকাল এ ভয়াবহ জাহান্নামে যেতে হবে।

রবিন: তোদের আল্লাহ দয়ালু হলে জাহান্নাম কেন বানালেন?

আব্দুল্লাহ: আচ্ছা ভাইয়া, আমাদের মা একদিকে খুব দয়াদ্র, আবার অন্যদিকে শাস্তদাতা। আমরা যখন মায়ের আদেশ অমান্য করি, কোন অপরাধ করি, অন্য ভাইবোনদের সাথে অন্যায় আচরণ করি তখন তিনি আমাদের শাস্তি দেন। তার অর্থ এই নয় যে তিনি দয়ালু নন। বরং তিনি ন্যায়বিচার করেন। অপরাধ করলে মা শাস্তি দিবেন এই ভয় যখন একজন সন্তানের মধ্যে গ্রোথিত হয় তখন সে আর অপরাধমূলক কাজ করে না।

ঠিক তেমনি পরম দয়ালু আল্লাহ মহান্যায়বিচারক। যদি জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তির বিধান না থাকত। তাহলে পৃথিবীতে এক বান্দা আর এক বান্দার উপর কেবল জুলুম করে যেত, অপকর্মে সারা দুনিয়া নরকে পরিণত হত। মানুষ দুনিয়া তে ভালো কাজ করত না। আর আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত এর জন্য। তাহলে যারা ইবাদত করে না, আল্লাহর নাফরমানি করে যায় তাদের কেন কোন শাস্তি হবে না?

রবিন : ঠিক বলেছ তুমি। আমি আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতাম।

আব্দুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ, আপনি যে এখন বুঝতে পেরেছেন।

তবে আপনার প্রশ্নটা আল্লাহ আছে কি না এবং আল্লাহর ন্যায়বিচার কে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

রবিন: তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব ও ন্যায়বিচার এর বিষয় টা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল।

আব্দুল্লাহ : বলছি ভাইয়া। মনোযোগ দিয়ে শোনেন।ন্যায়বিচারক আল্লাহ তার নবীগণের কাছে পাঠানো ওহীর মাধ্যমে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। যেন মানুষ ভুল না করে। মুমিনের জন্য আল্লাহর ভয় হলো তার ঈমানকে মজবুত করার অংশ। আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, ভয় ও আশা তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাসের নামান্তর।

একজন মুমিন আল্লাহর পুরষ্কার ও শাস্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে জানে। সে জন্য আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিকটবর্তী হতে চায়। এভাবেই তার আত্মিক পরিশুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়।

সে আল্লাহর দেওয়া সীমা সমূহকে সম্মান করে, সচেষ্ট থাকে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে আল্লাহর রহমতের খোজ করে। কারণ এটি তাকে বিচার দিবসের ভয়াবহ অবস্থা ও জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করবে।

কুরআন মাজীদ এ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ

অর্থ:"আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য থাকবে দু'টি জান্নাত।"(সুরা আর-রহমান:৪৬)

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

অর্থ:"আল্লাহর বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল"(সূরা আল-ফাতির:২৮)

"মুমিন তো তারাই যারা প্রতিফল দিবস কে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত প্রকম্পিত। নিশ্চয়ই তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে নি:শংক থাকা যায় না। (সূরা আল মাআরিজ:২৬-২৮)

এ প্রসংগে নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,মুমিনের হৃদয় যখন ভয় ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ তখন তার আশা পূরণ করেন। এবং সে যার ভয় করে তা থেকে তাকে রক্ষা করেন। (ইবনে মাজাহ)

রবিন: আখিরাত অস্বীকারকারীরা বিচার দিবস এ জান্নাত জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করলে তাদের অবস্থা কেমন হবে?

আব্দুল্লাহ : এ বিষয় এ আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীম এ বলেছেন–

'তারাই সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের নিজেদের ও পরিবারের ব্যাপার এ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের জন্য উপর ও নীচ হতে আগুনের জ্বালা থাকবে। এ শাস্তির দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদের সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দারা আমাকে ভয় কর।" (সূরা আয-যুমার:১৫-১৬)

রবিন : অনেক ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ। তোমার আলোচনা আমাকে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় করল। এখনই আমি প্রকৃত মুসলিম হচ্ছি - 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" । মসজিদে চল। আমি তোমার সাথে ওযু করে নামায পড়ব।

কথোপকথন-১৩

আল্লাহ যত নবী পৃথিবীতে প্রেরন করেছেন,তাদেঁর মধ্যে একজনও কেন মহিলা নেই? পুরুষকে কেন নবী হিসাবে পাঠানো হয়েছে?

এলিন: হাই আবদুল্লাহ! কোথায় যাচ্ছিস?

আবদুল্লাহ:আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা।

মা এর জন্যে নতুন হিজাব নিতে যাচ্ছি।

এলিন: তোদের ধর্মে নারীদের এতো সম্মান, তাহলে তোদের কোনো মহিলা নবী নেই কেনো?

আবদুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ্। সাধারন মানুষের চাইতে নবীগনের বেশি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং তা সমাধান করতে হয়। যা একজন নারীর জন্যে চ্যালেঞ্জিং।

এলিন: কেমন চ্যালেঞ্জিং?

আবদুল্লাহ: নবীকে অনেক মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে যা নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

এলিন: নবী ইমামতি করেছে নারী নবী ইমামতি করলে কি সমস্যা?

আবদুল্লাহ: যেমন - নবীকে নামাযে ইমামতি করতে হবে যদি মহিলা ইমাম হয় আর পুরুষরা পেছনে থাকে তাহলেই আল্লাহর দিকে মনযোগের চাইতে উক্ত মহিলার দিকে মনযোগ বেশি যাবে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান সেটাই প্রমান করে।

এলিন: সে মানলাম। কিন্তু তোরা মুসলিমরা কি মেয়েদের এতোই দুর্বল ও অদক্ষ মনে করিস যে তোদের নবীদের মতো তারা অন্যদের দাওয়াহ দিতে পারতো না?

আবদুল্লাহ: পয়গম্বরকে মানুষের সাথে মেলামেশা করতে হয়। হাত মেলাতে হয় যা শরীয়া অনুযায়ী নারী নবীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, একজন পুরুষ নবী সহজে করতে পারে।

এছাড়া নারীগনকে বাচ্চা ১০ মাস ১০দিন গর্ভে ধারন করতে হয়। সংসার ছেলে-মেয়ে দেখাশুনা করতে হয় তার উপর যদি নবীর দায়িত্ব এলে তাহলে তা অবিচার হয়ে যায়।

এলিন: তাহলে কি এটা ন্যায়বিচার করা হলো?

আবদুল্লাহ: আল্লাহ বলেন-‘‘আমি ন্যায়বিচারক ও দয়ালু"

আল্লাহ নারীগনকে পবিত্র কুরআন অনেক সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে বিবি মারিয়ম (আঃ) তিনি সমস্ত পৃথিবীর নারীশ্রেষ্ঠা, হযরত আয়েশা হযরত ফাতেমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহতাআলা দায়িত্বের সমবন্টন করার ক্ষেত্রেই নারীগনকে নবী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠাননি।

আল্লাহ্‌ সবচেয়ে ভালো জানেন। আশা করি আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়েছেন।

এলিন: ঠিকাছে এখন কাজে যাচ্ছি।

কথোপকথন-১৪

যদি আল্লাহর ইচ্ছাই সব হয়ে থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই?

সাহিল: হাই আলী! শুনলাম তোমার নাকি আরেকটা মেয়ে হয়েছে?

আলী: সবই আল্লাহর ইচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

সাহিল: এই যে বললে সবই আল্লাহর ইচ্ছে, যদি আল্লাহর ইচ্ছাই সব হয়ে থাকে তাহলে নিজের ইচ্ছা বলতে কি কিছুই নেই?

আলী: আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহর ইচ্ছেতেই সব হয়ে থাকে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অর্থ:"আর তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই। আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"(সূরা কাসাস : আয়াত-৭০)

এছাড়া তিনি আরো বলেন –

"তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ"। (সূরা দাহার: ৩১)

সাহিল: তাহলে কি নিজের ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই ? যারা চুরি ডাকাতি অন্যায় করে তাহলে তারা কেনো শাস্তি পাবে সেসব তো আল্লাহর ইচ্ছেতেই হচ্ছে।

আলী: আমৃত্যু স্বাধীন ইচ্ছা,একটা পরীক্ষা-তবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ইচ্ছা আছে উদাহরন দ্বারা বলা যায়।

ধরুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে আপনার বাড়ি তথা প্রত্যেক এলাকার বিদ্যুৎ আসে। যদি কেউ নিজের আঙ্গুল কারেন্টের লাইনে রাখে সে ধাক্কা খাবে।

এটা তার দোষ, আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন সে ইচ্ছে করলে বিদ্যুৎ হাত দেবে আর ইচ্ছা না করলে দেবেনা।

কিন্তু তার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দায়ী করা যাবেনা সুতরাং দোষটা পড়ে পুরোপুরি মানুষের- কেন সে বিদ্যুতে হাত দিলো?

আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন কারন প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা এক একটা পরীক্ষা।

সাহিল: তাহলে মানুষ যা করে তা তার ইচ্ছাধীন?

আলী: হ্যা,আল্লাহ তার ইচ্ছেকে স্বাধীন করে দিয়েছেন কারন প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা এক একটা পরীক্ষা।

আল্লাহ পবিত্র কুরআন ও রাসূল ﷺ জীবনাদর্শে প্রকাশ করেছেন। সে যদি অনুসরন করে যত বছরই সে বেচে থাকুক ২০ বছর ৫০ বছর ১০০ বছর তার জীবন পদ্ধতির ও স্বাধীন ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই বিচারের ফলাফল আল্লাহ প্রকাশ করবেন। আর সে যদি সেভাবে অনুসরন না করে সে অকৃতকার্য।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন —

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ

“যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।”(সুরা মুলক-২)

সাহিল:বুঝলাম,আজ তবে আসি পরে আবার কথা হবে।

উপসংহার

আমাদের কাজ হলো মানুষের নিকট সত্যের দাওয়াত পৌছে দেয়া।মিথ্যা একদিন বিলুপ্ত হবেই,ইন শা আল্লাহ। বিজয় আমাদেরই হবে নিশ্চিত।মুমিন কখনো সাময়িক পরাজয়ে ভয় করে না।আমাদের সাহায্যকারী তো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।আমরা আমাদের সাধ্যমত সত্যের দাওয়াত পৌছে দিব,সত্যের বানী পৌছে দিব।আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে সমগ্র মানবজাতির কল্যানের জন্য বের করেছেন।আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন–

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

“তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত,যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে।”(সূরা আলে-ইমরান:১১০)

ইসলামের শত্রুরা যতই অপচেষ্টা করুক তারা ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, ইন শা আল্লাহ। তাদের সব কৌশল বিফলে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ

‘আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৪)

ইসলামবিদ্বেশিদের ইসলাম নির্মূলের চেষ্টা কোনোদিন সফল হবে না। বরং ইসলাম তার আলোয় উদ্ভাসিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—-

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ۝
هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

“তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় তাদের মুখের (ফুঁক) দ্বারা, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে

সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।"(সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৩২-৩৩)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—-

يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আস-সফ:৮)

আমাদের কাজ হবে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা এবং সম্ভাব্য সব কৌশল প্রয়োগ করা। নিচে উল্লেখিত আল্লাহর বাণী থেকেই আমরা নিজেদের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন—-

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

'তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।'(সূরা আন-নাহল: ১২৫)

ইসলামের শত্রুদের নির্মূলে চেষ্টা যদি সর্বোচ্চ হয় তবে আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবেনই। প্রয়োজনে তিনি ফেরেশতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন। নিচের আয়াতগুলোয় লক্ষ্য করুন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন—-

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ۞

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ۞

وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ

‘আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না। আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা।” (সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ৬০-৬২)

আমাদের কাজ নাস্তিকদের সাধ্যমত সুপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করা। আমরা সুপথ দেখানোর পরও যদি ফিরে না আসে তবে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তো বলেই দিয়েছেন। তিনিই তাদের বিচারের ভার নিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—-

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُوَ يُدۡعَىٰٓ إِلَى ٱلۡإِسۡلَٰمِۚ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

‘সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম আর কে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।’(সূরা আস-সফ : ৭)

আরেক আয়াতে অবাধ্যাচারীদের সতর্ক করে আল্লাহ বলেন—

وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْۚ إِنَّهُمۡ لَا يُعۡجِزُونَ

“আর কাফিররা যেন কখনও মনে না করে যে, তারা (আযাবের) নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে, নিশ্চয় তারা (আল্লাহকে আযাব প্রদানে) অক্ষম করতে পারে না।” (সূরা আল-আনফাল: ৫৯)

তথ্যসূত্রঃ

wikipedia.com

Islamicask.com(ডাঃ জাকির নায়েকের প্রশ্নোত্তর পর্ব সমগ্র)

Hadithbd.com

Islamhouse.com(বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা:প্রতিরোধের উপায়)

বই:সত্যকথন

বই:আত্নবিশ্বাস

মাসিক আল-কাউসার

নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব | চিন্তাশীল মুসলিমের ব্লগ

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111557088/